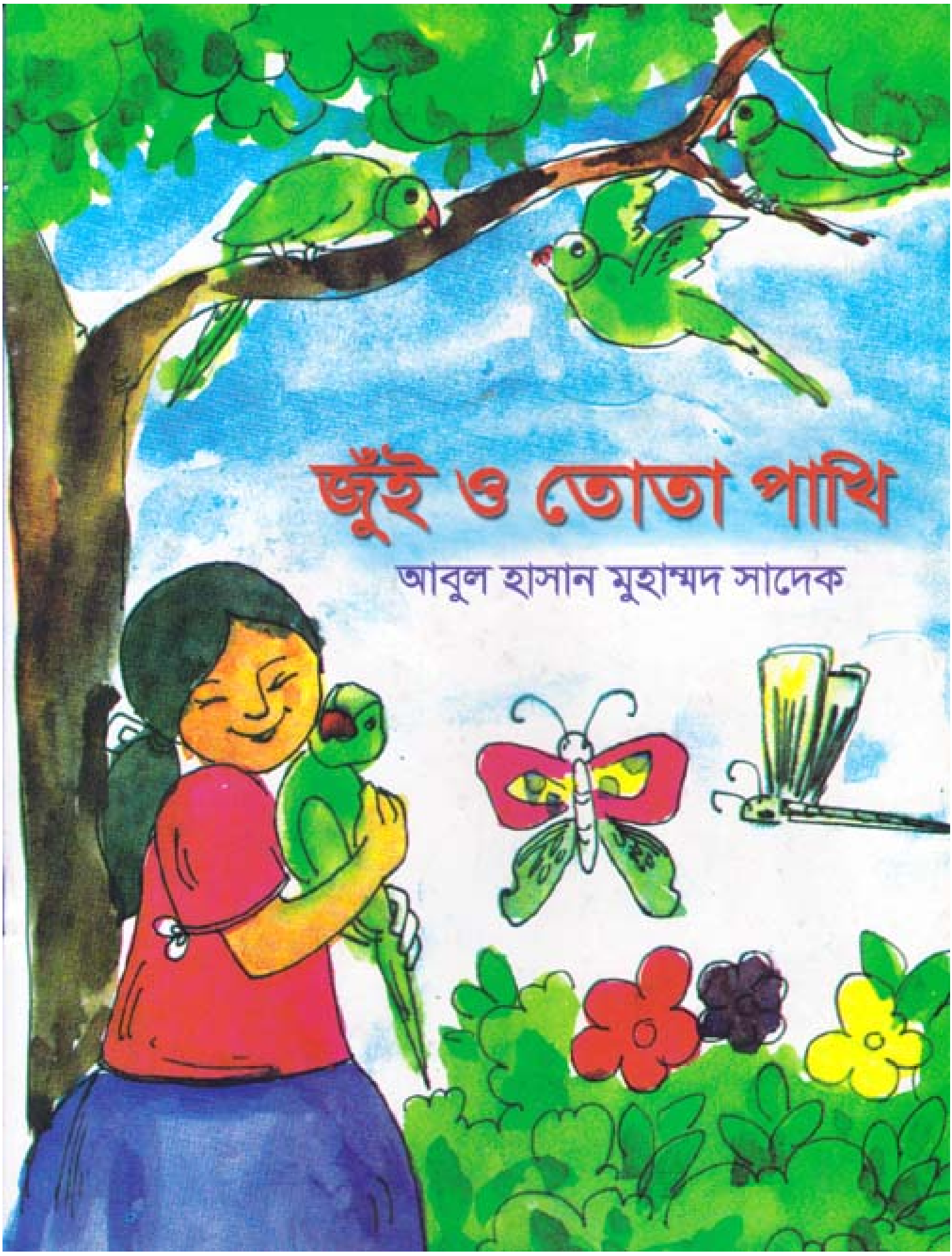

জুঁই ও তোতা পাখি

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

জুঁই ও তোতা পাখি
আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

© কথামালা

প্রকাশক
কথামালা
বাড়ি-১৪, রোড-২৮, সেক্টর-৭
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ০১৬৭৮-৬৬৪৪০১, ০১৭৯৯-১৮৫৫৪১

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০১৭

প্রচ্ছদ
মেভিস

মুদ্রণ
মেভিস প্রিন্টার্স

ঘরে বসেই কথামালা প্রকাশনীর বই পেতে
ভিজিট করুন : www.Rokomari.com

মূল্য : ৮০ টাকা

Jui O Tota Pakhi
Abul Hasan M. Sadeq

First Edition: Ekushe Book Fair, February 2017

Published by: Kothamala
House-14, Road-28, Sector-7, Uttara, Dhaka-1230
Phone: 01678-664401

Email : kothamalaprokashani@gmail.com
Website: www.aub.edu.bd/home/kothamala
www. aub.edu.bd/home/kothamala-publications

Price : Tk. 80.00

ISBN : 978-984-92518-8-0

জুঁই ও তোতা পাখি

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

কথামালা প্রকাশনী

জুঁই ও তোতা পাখি

ফুলের নামে নাম ওর।

জুঁই।

জুঁই ফুলের মতোই সারাক্ষণ গন্ধ ছড়ায় জুঁই। সাত বছরের জুঁই বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান তাই সীমাহীন আদরে দিন কাটে ওর।

তারপরও প্রায় সময়ই মুখ ভার করে থাকে জুঁই। কারণ, ওর ক্লাসের বন্ধুদের সবারই কত্তোগুলো ভাই-বোন। ওর আর কেউ নেই। একা। একটি খেলার সাথীও নেই। আম্মুর সাথে কি সারাক্ষণই খেলা যায়? বাবাকেও খুব একটা কাছে পায় না জুঁই।

জুঁইয়ের বাবা ব্যবসা করেন। ব্যবসার কাজে প্রায় সময়ই তাকে ঢাকার বাইরে থাকতে হয়। তবে যখন বাসায় ফিরে আসেন, তখন জুঁইয়ের জন্য অনেক কিছু নিয়ে আসেন। খেলনা, চিপস, চকলেট, নতুন জামা, আরো কতো কী! এসব পেয়ে জুঁই খুব খুশি হয়। তার চেয়েও বেশি খুশি হয় বাবাকে কাছে পেয়ে। দৌড়ে গিয়ে বাবার কোলে ওঠে। বলে, এবার আর তোমাকে যেতে দেবো না। দেবো না। দেবো না।

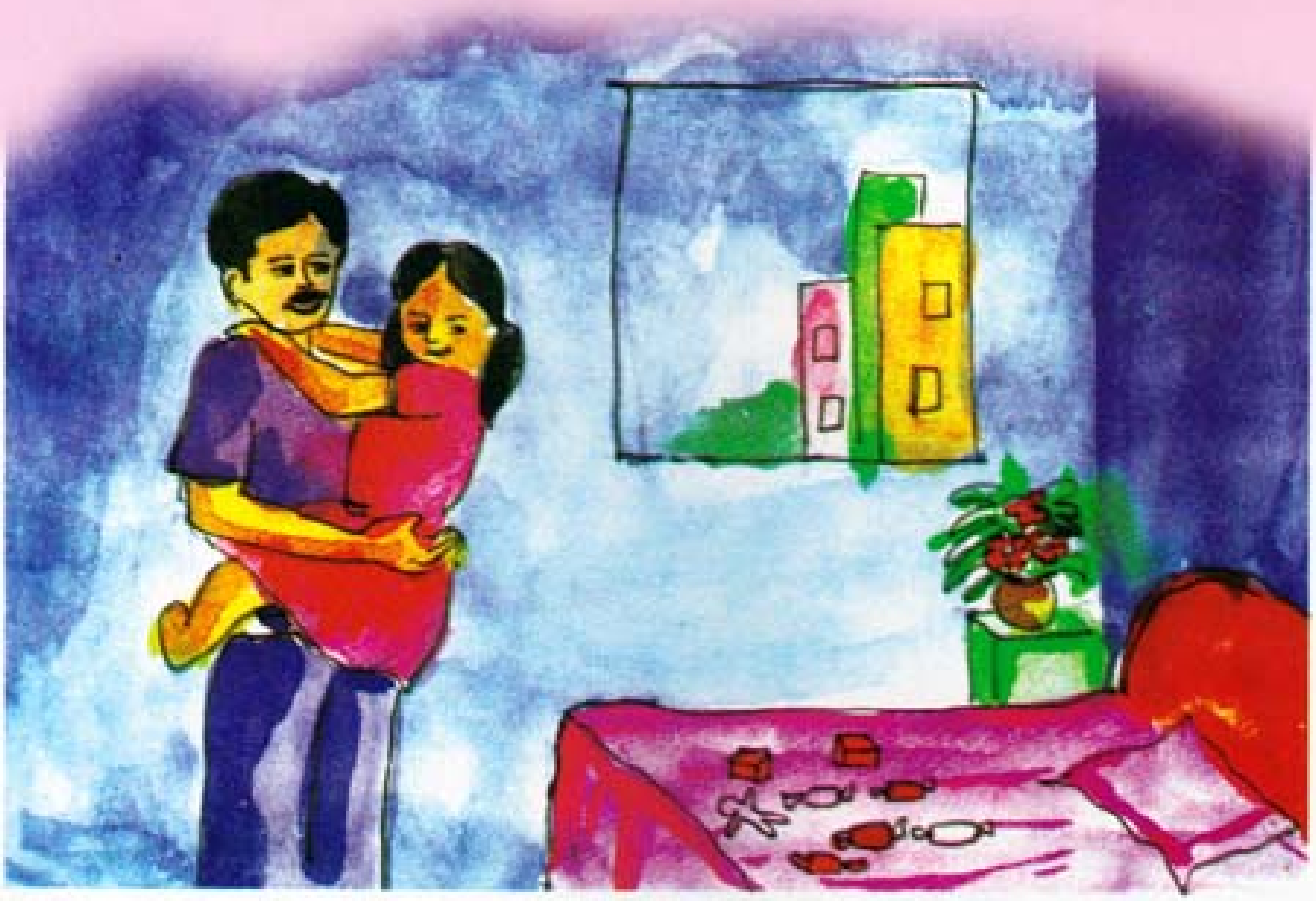

মেয়েকে বুকে চেপে ধরে হাসেন তিনি। বলেন, যেতে না দিলে তোমার জন্য এত্তোসব আনবো কী করে। জুঁই অভিমান করে বলে, লাগবে না আমার এত্তোসব। আমি কোথাও বেড়াতে যেতে পারি না। কারো সাথে খেলতে পারি না। একা একা কি খেলা যায়! তুমিই বলো! জুঁইয়ের বাবা, হাসেন। অনেক দিন পর মেয়েকে কাছে পেয়ে কষ্ট ভুলে যান। মেয়ের পিঠে, মাথায় হাত বুলান। ওর তুলতুলে গালে চুমু খান। জুঁই বাবার মুখটা নিজের মুখের দিকে তুলে ধরে গাল ফুলিয়ে বলে, আচ্ছা বাবা, তোমার কি আরেকটা জুঁই আছে? সেই জুঁইকে কি তুমি আমার চেয়েও বেশি ভালোবাসো?

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে জোরে হেসে বাবা জানতে চান, কেন মা?

অভিমান ভরা কণ্ঠস্বর জুঁইয়ের। বলে, আগে বলো, তোমার আর একটা জুঁই আছে কি না?

জুঁইয়ের বাবা জুঁইয়ের মাথাটা গভীর আবেগে বুকে চেপে ধরে বললেন, না মা। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

তা হলে কেন তুমি আমার কাছে থাকো না? আমার বন্ধুদের আব্বুরা স্কুল ছুটির পর লাইনে দাঁড়িয়ে ওদেরকে স্কুল থেকে নিয়ে আসে। তুমি একদিনও আমাকে আনতে যাও না!

মেয়ের কথায় বাবা ভীষণ অবাক হন। এতোটুকু মেয়ের এতো অভিমান।

অভিমানে এতো কথা। বাবা বললেন,

ব্যবসার কাজে যে আমাকে বাইরে থাকতে হয়, মা।

তা হলে বলো, ব্যবসাই তোমার আরেকটা জুঁই।

কক্ষণো না। আমার একটাই জুঁই। এই একটা জুঁই এর জন্যই তো আমি এতো কষ্ট করি।

আমি কিছু জানি না। আমি তোমাকে আর যেতে দেবো না, দেবো না, দেবো না। ব্যাস।

মেয়ের সাথে বেশ কয়েকদিন কাটালেন বাবা। কালই আবার যেতে হবে। এখন থেকেই ভাবনায় পড়েন। মেয়েকে কীভাবে বুঝাবেন তিনি। যাবার সময় হুলুস্থুল কাণ্ড। তাকে কিছুতেই যেতে দেবে না

শেষে বাবা তাকে বুঝালেন, এমন একটা জিনিস এবার তিনি জুঁইয়ের জন্য নিয়ে আসবেন, যা দেখে জুঁই বাবাকেও ভুলে যাবে। দারুণ মজার জিনিস। এত্তো মজার জিনিসের কথা শুনে জুঁই বাবাকে যেতে দিলো। আর অপেক্ষা করতে থাকলো, বাবা কবে তার মজার জিনিস নিয়ে ফিরে আসবে। প্রায় একমাস পরে জুঁইয়ের বাবা ফিরে আসেন। সাথে অনেক জিনিস। সব জুঁইয়ের জন্য। কিন্তু জুঁই তার বিশেষ জিনিস খুঁজছে। বাবা তা বুঝতে পেরে মেয়েকে কোলে তুলে নিলেন। বললেন,

চোখ বন্ধ করে থাকো মা। আমি যতোক্ষণ না চোখ খুলতে বলবো ততোক্ষণ তুমি চোখ খুলবে না কিন্তু।

জুঁই চোখ বন্ধ করে থাকলো। জুঁইকে কোলে নিয়ে বাবা বারান্দায় গেলেন।

বাবা বললেন, এবার চোখ খোলো মা।

চোখ খুলে জুঁই লাফিয়ে বাবার কোল থেকে নেমে পড়লো। বারান্দায় ঝুলানো খাঁচার ভেতর তোতা পাখি দেখে আনন্দ তার ধরে না।

বাবাকে সত্যি সত্যি ভুলে গেলা সে। খাওয়া, ঘুম, পড়াশুনা সব ভুলে গেলো। তোতা পাখি নিয়েই সারাক্ষণ থাকে জুঁই। দু'জনের মাঝে গভীর বন্ধুত্ব হয়ে যায়। সুখ দুঃখের কথা হয়। একদিন তোতা পাখির খুব মন খারাপ। জুঁই এর কারণ জানতে চাইলো। তোতা পাখি বললো,

বন্ধু, আমার বাবা, মা, ভাই, বোন ও খেলার সাথী সবাইকে খুব মনে পড়ছে। তুমি যেমন তোমার বাবা-মা'র সাথে থাকো, আমারও তেমনি আমার বাবা-মা'র সাথে থাকতে ইচ্ছে করে। গাছে গাছে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে। শিকারিরা আমাকে ধরে খাঁচায় বন্দী করেছে। তোমার বাবা তাদের কাছ থেকে আমাকে কিনে এনেছেন। আমার এই বন্দী জীবন ভালো লাগে না, বন্ধু!

তোতা পাখির কষ্টের কথা শুনে জুঁইয়ের খুব মায়া হয়। সে তার বাবাকে বললো তোতাপাখির কষ্টের কথা। বাবাকে নিয়ে গেলো তোতা পাখির কাছে। বাবা তোতা পাখিকে জিজ্ঞেস করলেন,

কি জুঁইয়ের বন্ধু, তোমার নাকি খুব মন খারাপ? কিন্তু জুঁই তো তোমাকে পেয়ে খুবই খুশি। বলো, কি করলে তোমার মন ভালো হবে? তবে জুঁইকে ছেড়ে যেতে চেয়ো না। জুঁই তোমাকে খুবই ভালোবেসে ফেলেছে।

তোতা পাখি বললো, আবার যদি তুমি রাজশাহী যাও, তবে সেখানকার সবচেয়ে বড় আম বাগানটায় যেও। সেখানে আমার সবাই থাকে। বাবা, মা, বন্ধু, ভাই-বোন সব। ওদেরকে বলো, আমি ভালো আছি। ওদের কথা আমার খুব মনে পড়ে। আর বলো, আমি জানতে চেয়েছি। বাঁচার পথ কী?

জুঁইয়ের বাবা বললেন, তুমি কি জুঁইকে ছেড়ে চলে যেতে চাও? জুঁই যে তা হলে কেঁদে কেটে একাকার করে ফেলবে।

তোতা পাখি বললো, আমি অনেক দিন বাঁচতে চাই। কীভাবে অনেক দিন বাঁচা যায়, এর উত্তরটা তুমি আমাকে এনে দাও। তা হলেই আমার মন ভালো হয়ে যাবে।

দু'দিন পরেই জুঁইয়ের বাবা রাজশাহী গেলেন। কাজের ফাঁকে গেলেন বড় আম বাগানটায়। খুঁজে বের করলেন তোতা পাখির আপন জনদের। তাদেরকে খুলে বললেন তোতা পাখির কথা।

অবাক কাণ্ড। তোতা পাখির সব কথা শোনার পর হঠাৎ করেই তার সব আপনজন একেবারে চুপ হয় গেলো। নিথর নিস্তব্ধ। তোতা পাখির মা অজ্ঞান হয় পড়ে গেল মাটিতে। সম্ভবত মারা গেছে।

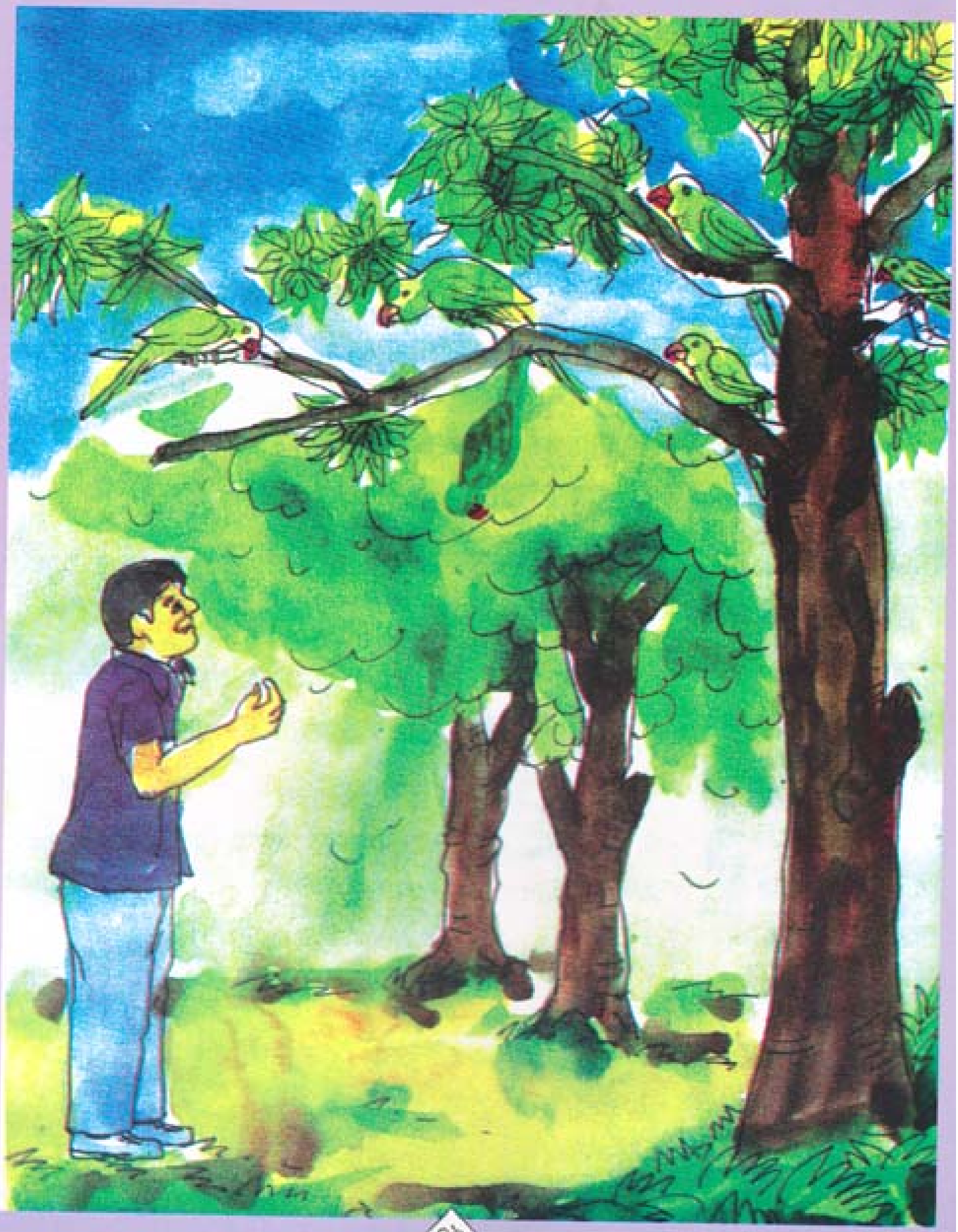

জুঁইয়ের বাবা বুঝে উঠতে পারলেন না। ভাবলেন, তোতা পাখির কথা শুনে হয়তো ওরা দুঃখে-কষ্টে কাতর হয়ে গেছে। তার মাও মারা গেছে কষ্ট সইতে না পেরে।

বাসায় ফিরে জুঁইয়ের বাবা দেখলেন খাঁচার তোতা পাখির তখনও মন খারাপ। জুঁই বললো, সে নাকি প্রতিদিনই জানতে চায় বাবা ফিরছে কি না। বাবা সেখানে গিয়েছে কি না। জুঁইকে সাথে নিয়ে বাবা গেলেন তোতাপাখির কাছে। গিয়ে জানালেন সব ঘটনা। অবাক কাণ্ড। ওদের কথা শোনার পর তোতা পাখিটিও হঠাৎ করেই বিমর্ষ হয়ে গেলো। একটু পরেই লুটিয়ে পড়লো নিচে। তোতা পাখির মৃত্যুতে জুঁইয়ের কান্না আর থামে না। বাবা অনেক বুঝালেন। তারপর জুঁইকে সাথে করে খাঁচা নিয়ে গেলেন পাশের মাঠে। ওখানে খাঁচার দরজা খুলে পাখিটিকে ফেলে দিলেন।

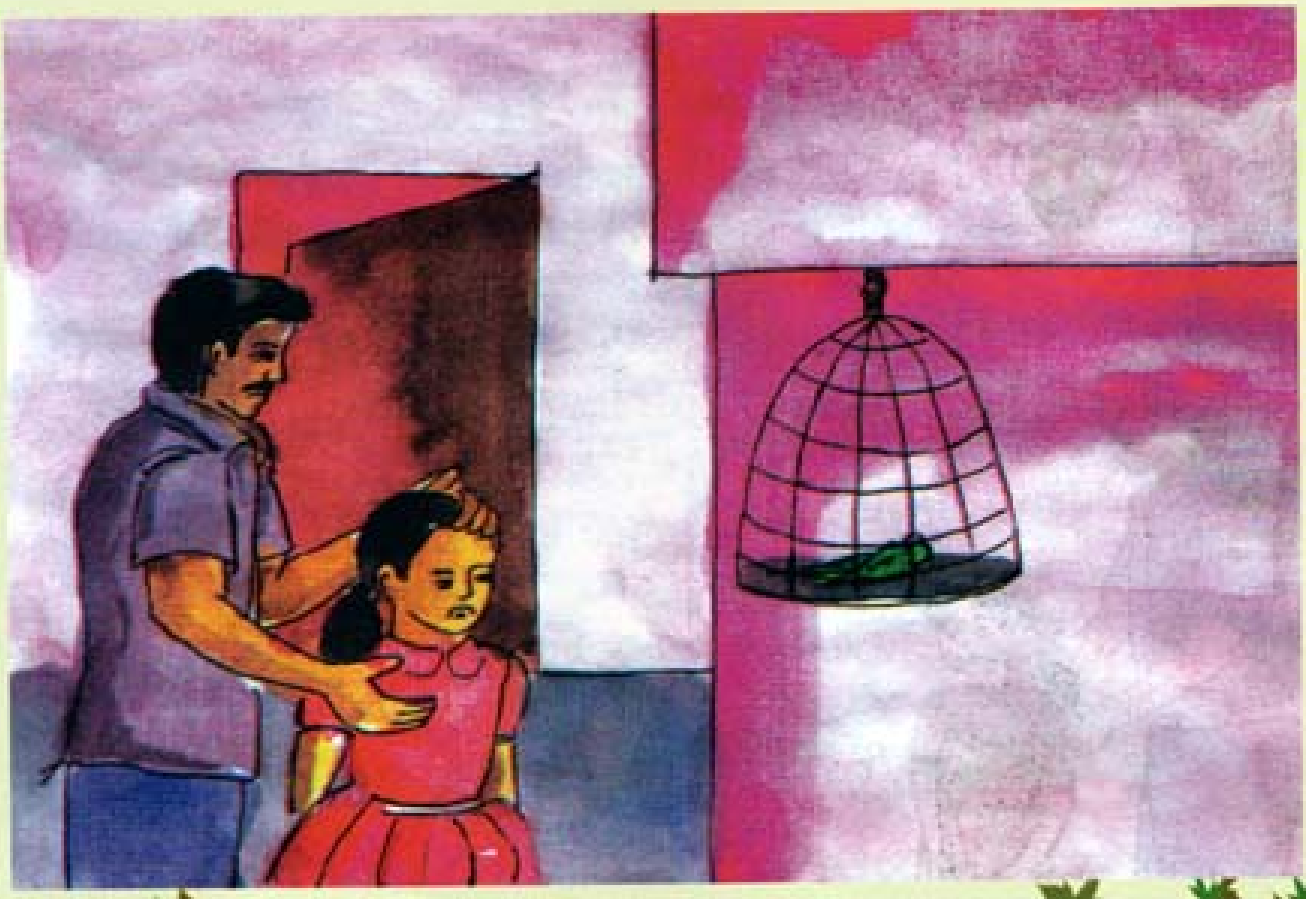

বিস্ময়ে ওদের চোখ স্থির হয়ে গেলো। তোতাটিকে ফেলামাত্রই সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং একটু পরেই উড়ে গিয়ে বসলো পাশের একটি গাছের ডালে।

এবার জুঁই ও জুঁইয়ের বাবা দু'জনই হতবাক হয়ে গেলো। অবাক বিস্ময়ে জুঁই জানতে চাইলো, তুমি না মরে গিয়েছিলে বন্ধু?

তোতা পাখি উত্তর দিলো, আমি মরিনি বন্ধু। বাঁচার জন্য অভিনয় করেছিলাম। আমি তোমার বাবার কাছে বলে দিয়েছিলাম বাঁচার পথ কী, এটি জেনে আসতে। আমার মা ও আমার আপনজনেরা অভিনয়ের মাধ্যমে তা তোমার বাবাকে জানিয়ে দিয়েছে। তোমার বাবা সেটা বুঝতে পারেননি।

জুঁইয়ের খুব মন খারাপ হলো। সে আর কোন কথা না বলে বাবার হাত ধরে ফিরে আসার জন্য পা বাড়ালো।

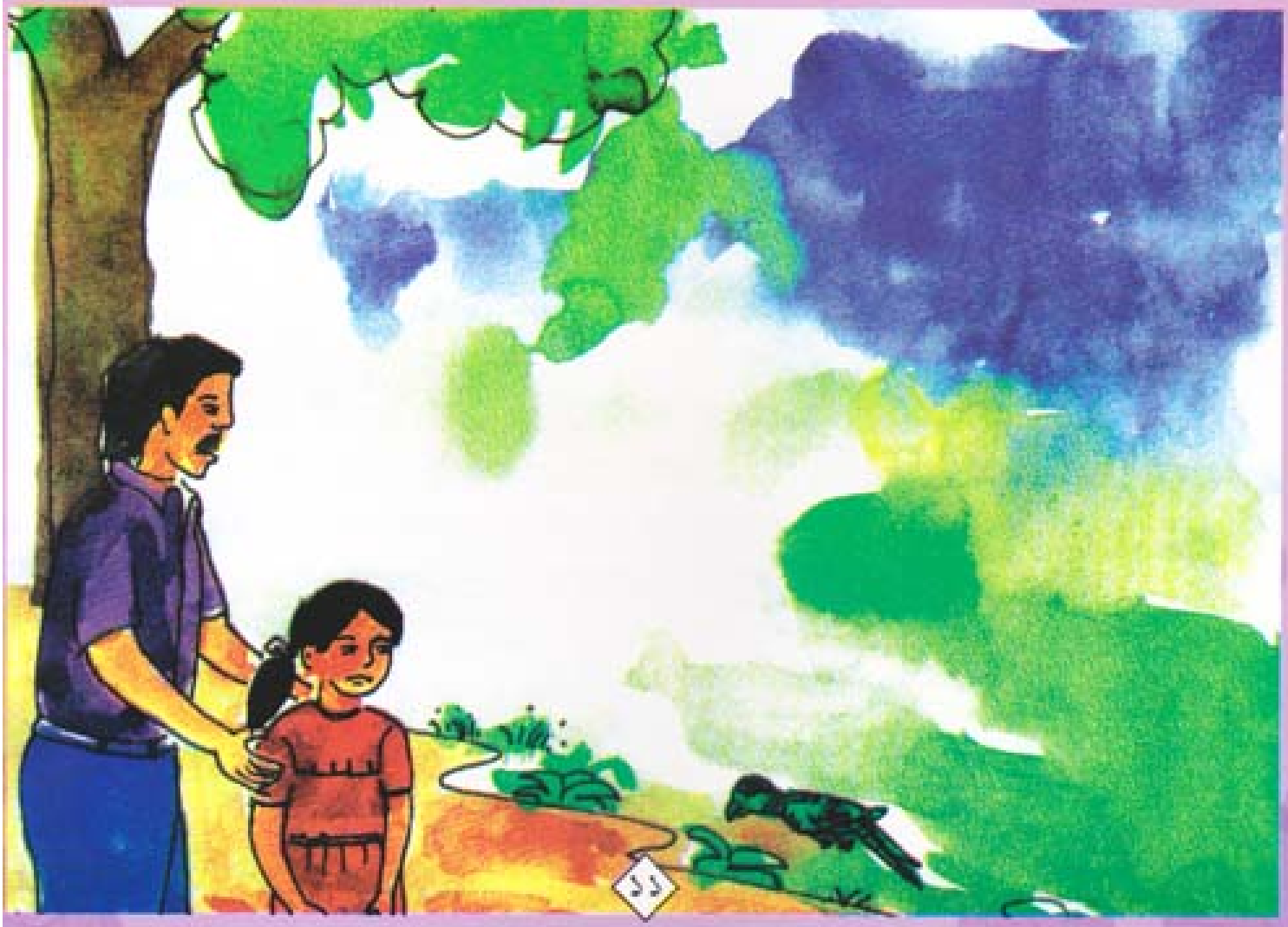

তোতা পাখি ডাকলো। বললো,

দাঁড়াও বন্ধু, আর একটা কথা শুনে যাও। আমার অভিনয়ে তুমি খুবই কষ্ট পেয়েছো, আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু বন্ধু, তুমি আমাকে এতো বেশি ভালোবেসেছো যে, আমি যেতে চাইলেই তুমি আমাকে যেতে দিতে না। বাবার জন্য তোমার যেমন মন কাঁদে। আমারও তেমনি আমার বাবার জন্য মন কাঁদে। তুমি যেমন সারাক্ষণ ওদের কাছে পেতে চাও, আমিও তেমনি সারাক্ষণ ওদের কাছে পেতে চাই। আর মৃত্যুর অভিনয় করে আমি বেঁচেছি। কিন্তু যদি তা না করতাম, তা হলে হয়তো একদিন সত্যি সত্যি আমি মরে যেতাম। তোমার ভালোবাসা আমাকে বাঁচাতে পারতো না।

একটু থেমে তোতা পাখি আবার বললো, আমাকে ভুল বুঝো না, বন্ধু। আমিও তোমার মতো।

তোতা পাখির কথা শুনে জুঁইয়ের দু'চোখ বেয়ে কান্না গড়িয়ে পড়লো।

জুঁই বললো,

না, বন্ধু। তোমার প্রতি আমার আর কোন রাগ নেই। আমি ও আমার বাবা তোমাকে খাঁচায় বন্দী রেখে ভুল করেছি, অন্যায় করেছি, সেজন্য তুমি আমাদের মাফ করে দাও। তুমি যাও বন্ধু। তোমার বাবা, মা, আপনজনদের কাছে যাও।

তোতাপাখি বললো, তা হলে বন্ধু, একবার বেড়াতে এসো আমাদের আম বাগানে।

জুঁই চোখ মুছে বললো,

আসবো। বাবা-মা'কে সাথে নিয়ে আসবো।

তোতা পাখি ডানা ঝাপটে আকাশের দিকে উড়ে চললো।
জুঁই পেছন থেকে হাত নাড়লো।

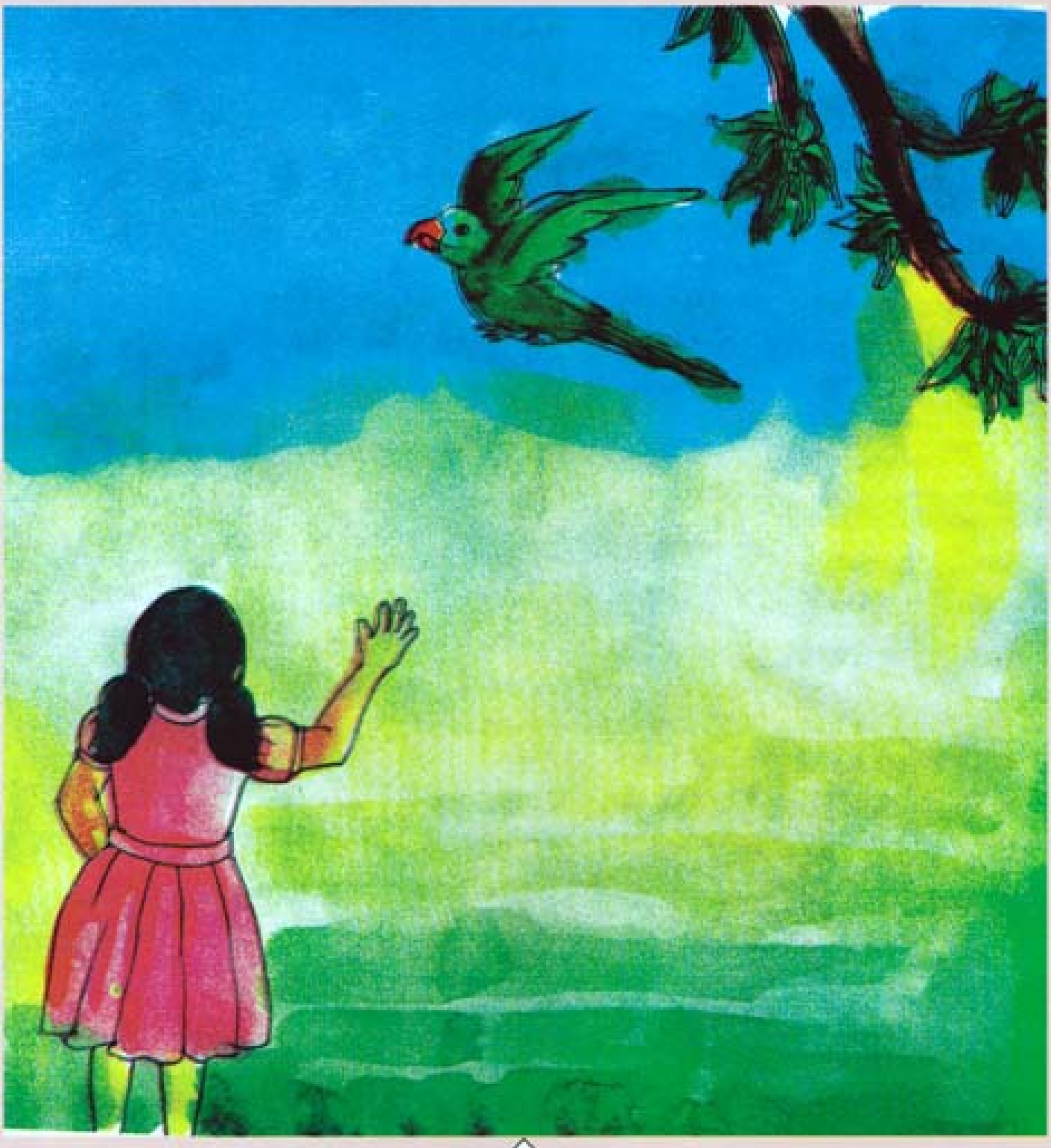

জাফার

এক

ওর এখন খুশির সীমা নেই। স্কুলের মধ্যে সে একাই "গোল্ডেন - A" পেয়েছে। গোটা স্কুলে সে যেনো হিরো হয়ে গেছে। ছেলে মেয়ে সবাই তার দিকে ফিরে ফিরে তাকায়। তাকে নিয়ে আলোচনা করে। তার কাছাকাছি আসতে চায়। একটু কথা বলতে চায়। এমন কি সেদিন একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে তার অটোগ্রাফও নিয়ে গেলো।

জাফারের এ সফলতার পেছনে রয়েছে অনেক সাধনা। অনেক চেষ্টা। অনেক লেখাপড়া। কষ্ট করলে মিষ্ট ফলে। সে এর বাস্তব প্রমাণ পেয়েছে।

জাফারের পাশের বাড়ির ছেলে শিমুল। শিমুলের দুঃখের সীমা নেই। সে পরীক্ষায় ফেল করেছে। তার দিকেও ছাত্ররা ফিরে ফিরে তাকায়। কিন্তু তা হলো ঘৃণার তাকানো। সবাই তাকে ঘৃণা করে। অবহেলা করে। কোথাও সে মুখ দেখাতে পারে না। বখাটে ছেলেদের দল ছাড়া তার কোথাও স্থান নেই।

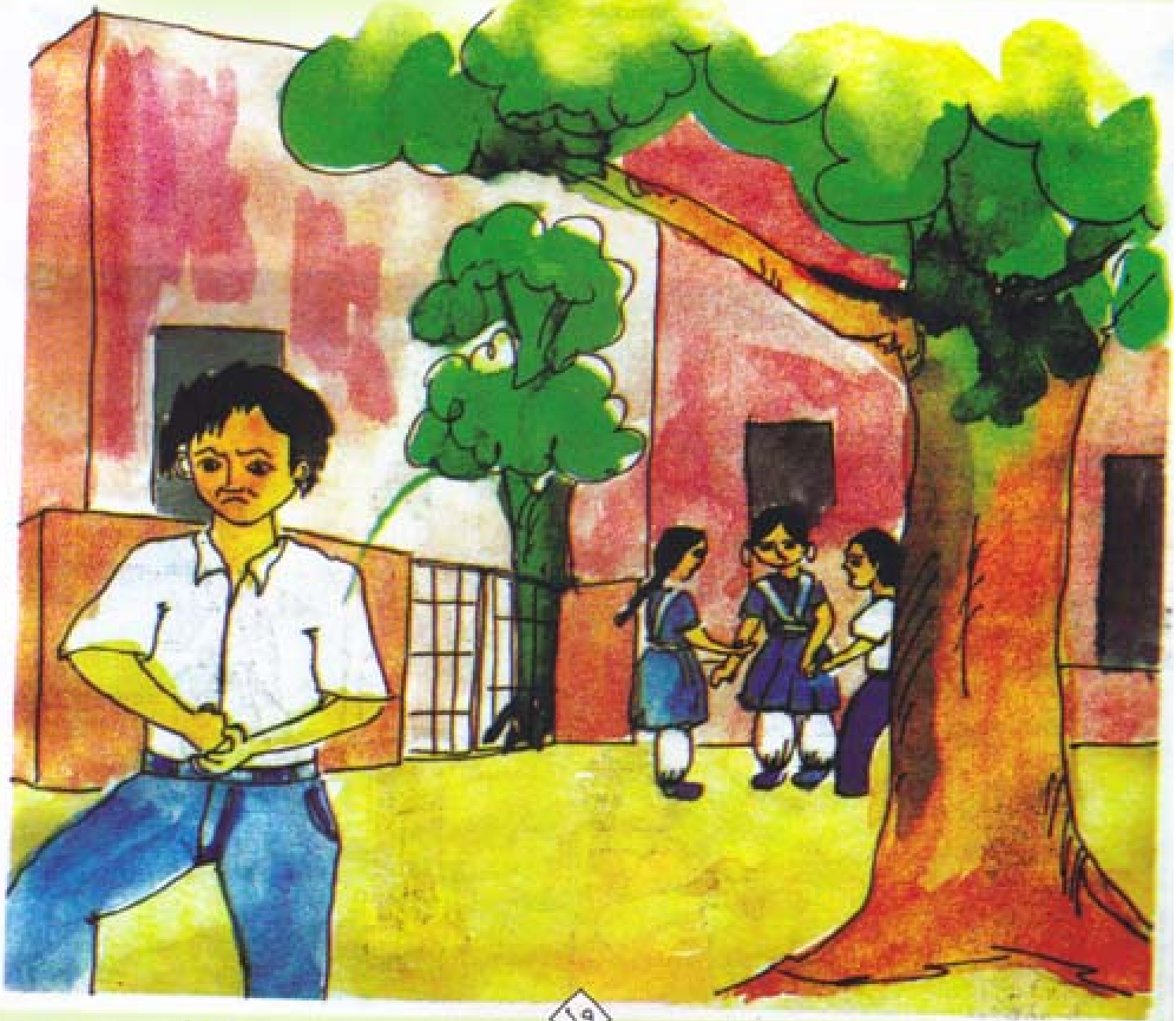

সেদিন শিমুল বখাটে ছেলেদের সাথে চুরি করার সময়ে ধরা পড়ে। দুষ্ট ছেলেদের সাথে সেও মার খায়। মারের ফলে তার মাথায় আঘাত লাগে। মাথা দিয়ে ঝরেছে রক্ত।

মা বাবার একমাত্র সন্তান শিমুল। শিমুলের এ অবস্থা দেখে তার বাবা মায়ের দুঃখের শেষ নেই। সমাজে তাঁরা মুখ দেখাতে পারে না। তাঁরা দুজনেই চোখের পানি ফেলেন। চোখের পানিতে দিন কাটে তাঁদের।

দুই

আজ ঈদ। খুশির দিন। চারদিকে সাজ সাজ রব। মা ভাবলেন, যতো খারাপই হোক, শতো হলেও শিমুল আমাদের একমাত্র ছেলে। কাজেই তাকে কিনে দিলেন নতুন কাপড়, ঈদের টুপি, সুরমা-আতর, আর নতুন জুতো। রান্না করলেন ফিরনি, সেমাই, আরো কতো রসালো খাবার। রোযার দিনে খাবার নিষেধ ছিলো। সন্ধ্যা পর্যন্ত না খেয়ে সারাদিন রোযা রাখতে হতো। কাল রোযা শেষ হয়েছে। আজ ঈদের দিন। সবাই আজ সকালেই ফিরনি, সেমাই দিয়ে মিষ্টিমুখ করলো।

সবাই চললো ঈদগাহে। ঈদের নামাযে শরীক হতে। মাঠ লোকে লোকারণ্য। কতো রং বে-রং এর কাপড়-চোপড়, আর কতো সাজে সজ্জিত সব মানুষ। ছোট ছেলে-মেয়েদের নতুন পাশাক নানা রঙ্গের বাহার। সবাই ঈদের নামাযের জন্য কাতারবন্দি হয়ে বসেছে। ইমাম সাহেব দাঁড়ালেন। নামাযের পূর্বে তিনি ওয়াজ নসিহত করতে লাগলেন। বললেন,

আজ খুশির দিন। আনন্দের দিন। এ আনন্দ হলো পরীক্ষায় "গোল্ডেন - A"

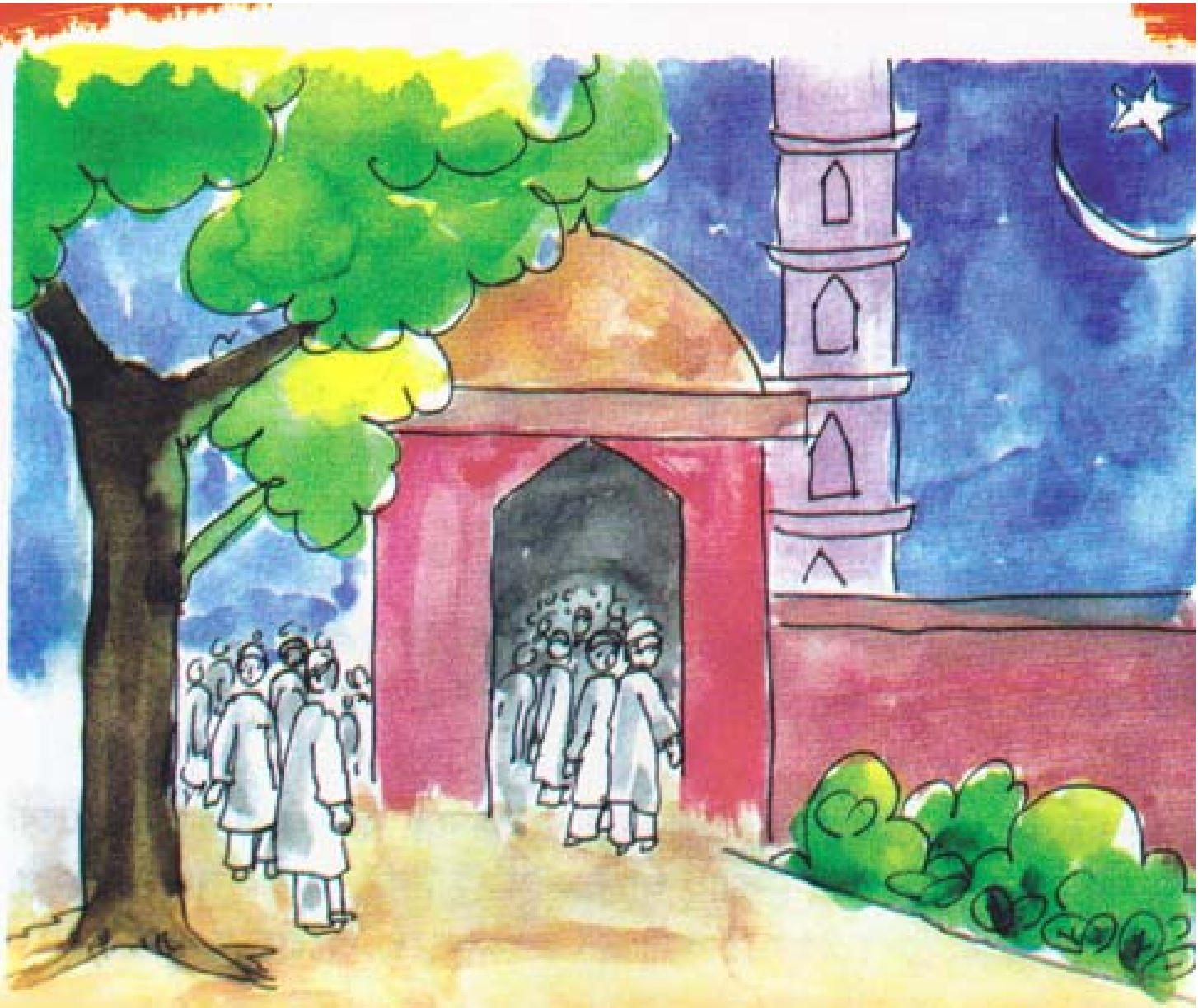

পাওয়ার আনন্দের মতো। রোযার মাসটা ছিল পরীক্ষার মতো। তাতে যারা ভালো করেছে, তাদের জন্য আনন্দ। যারা সবচেয়ে ভালো করে "গোল্ডেন - A" পেয়েছে, তাদের আনন্দ সবচেয়ে বেশি।

তিনি আরো বলতে লাগলেন, রোযার দিন আমরা খাইনা, যদিও ক্ষুধা ও খাবার দুটাই থাকে। আমরা সংযমের অভ্যাস করি। আমরা হালাল খাবার বর্জন করে সংযমের অভ্যাস করি, যেনো হারামের কাছাকাছিও না যাই। অর্থাৎ রমযান মাসে আমরা খারাপ কাজ বর্জন করার এক বিশেষ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হই। আরো পরীক্ষা হলো, এ মহান মাসে কে কতো ভালো কাজ করতে পারে। এ পরীক্ষায় যে যতো বেশি ভালো করতে পারে, ঈদে তার আনন্দ ততো বেশি।

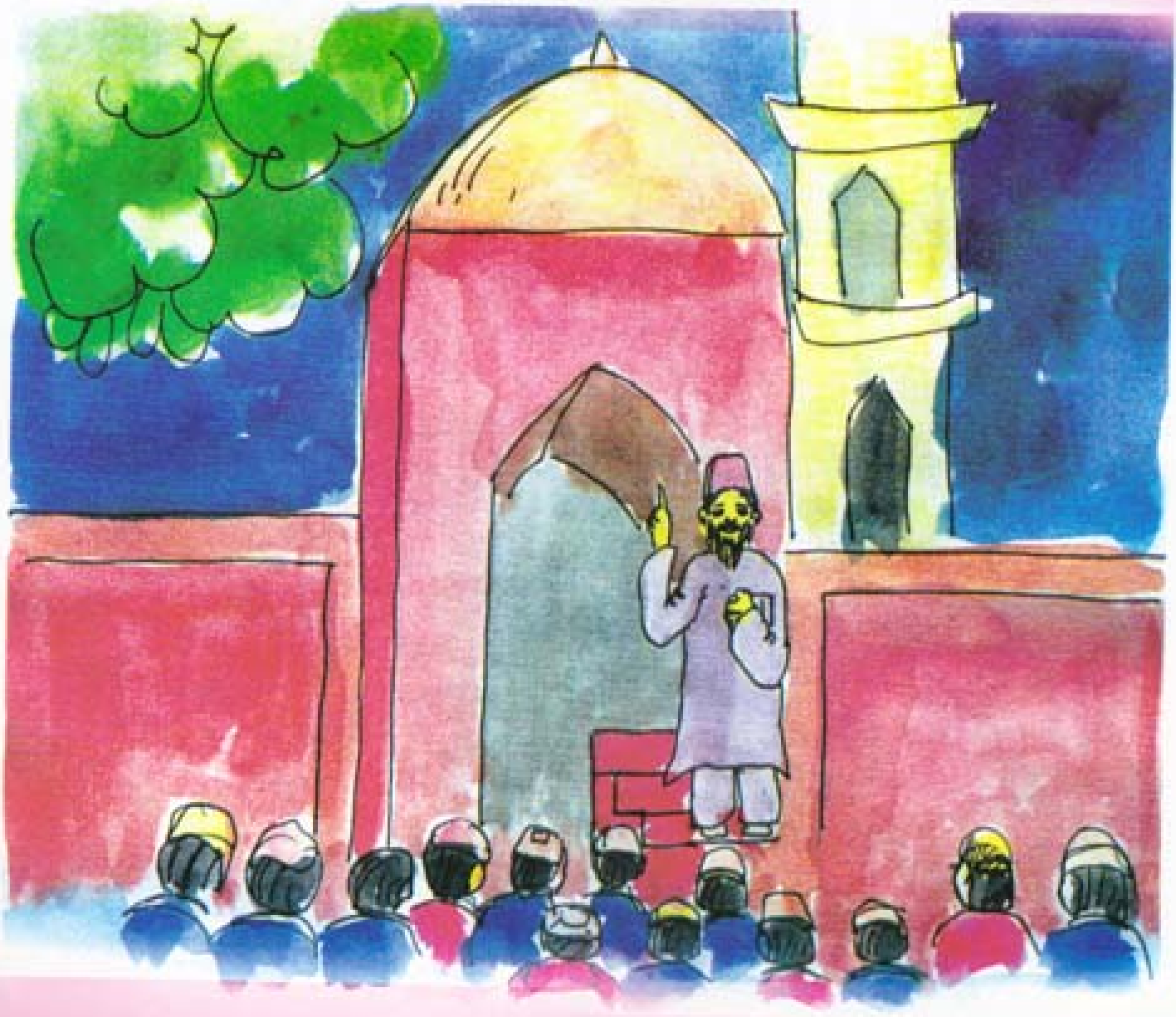

নামাজ শেষে ঈদগাহ মাঠের একটি গাছতলায় বসে শিমুল কাঁদছে। জাফারের দৃষ্টি পড়লো শিমুলের দিকে। দেখলো শিমুল কাঁদছে। জাফার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার! কাঁদছো কেনো? আজ তো খুশির দিন।

কাঁদতে কাঁদতে শিমুল জবাব দিলো, আমি ফেল করেছি। আমি জীবনে ফেল করেছি। আমি লেখাপড়ায় ফেল করেছি। আমি স্কুলে মুখ দেখাতে পারি না। আমি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে মার খেয়েছি। সমাজে কেউ আমাকে পছন্দ করে না। আমার বাবা-মা আমাকে অবহেলা করে। সবাই আমাকে ঘৃণা করে। আজ দেখি, আমি ঈদের দিনও ফেল করেছি। আমি রোযা রাখিনি। বাজে ছেলেদের সাথে ঘুরে ঘুরে সময় কাটিয়েছি। ভালো কাজ করি নি, বরং খারাপ কাজ করেছি। আমার আজ ঈদ নেই। আনন্দ নেই। আমি মরে যেতে চাই। এ বলেই সে কান্না শুরু করলো।

জাফার সান্ত্বনা দিয়ে বললো: না, কাঁদো না। আজ কান্নার দিন নয়। আজ ঈদের দিন, খুশির দিন। সে শিমুলকে জড়িয়ে ধরে বললো: ভাই শিমুল, তুমি যদি আজ ভুল স্বীকার করে আল্লাহর নিকট মাফ চাও, আর খারাপ কাজ ত্যাগ করো, ভালো কাজ করার প্রতিজ্ঞা করো, ঠিকমতো স্কুলে যাও, ভালোভাবে লেখাপড়া করো, তা হলে তোমার পাশের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। তা হলে তুমি "গোল্ডেন-A" পাবে। লেখাপড়াসহ সব কিছুতেই শীর্ষে থাকবে।

আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে শিমুল বললো, সত্যি! তা হলে আমি আজ প্রতিজ্ঞা করলাম, আজ থেকে আমি খারাপ ছেলেদের সঙ্গ ছাড়বো। তুমি আমার বন্ধু হবে। আমি সব খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করবো। আজ থেকে ভালো হয়ে যাবো। আমি আব্বু আম্মুর কাছে গিয়ে মাফ চাইবো।

এ বলেই সে দৌড় দিল বাড়ির দিকে। কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে লুটিয়ে পড়লো মা-বাবার পায়ে। তার বাবা মনে করলো, সে হয়তো আবারও চুরি করতে গিয়ে মার খেয়ে এসেছে। ঈদের দিনেও চুরি? তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। ছেলেকে দু'কান ধরে টেনে দাঁড় করালেন, আর দিতে লাগলেন থাপ্পড়ের পর থাপ্পড়।

তার মা ফেরাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ছেলের খারাপ কাজের জন্য লজ্জা ও দুঃখে তাঁর বাবা নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না। তিনি মেরেই চললেন।

শিমুল কাঁদতে কাঁদতে বললো: আব্বু, আমাকে মারো, আরোও মারো। এমন সময় জাফার এলো। জাফার এ দৃশ্য দেখে বললা: চাচা, শিমুল আজ তার ভুল বুঝতে পেরেছে। ঈদগাহ মাঠে হুজুরের বক্তৃতা শুনে সে নিজের ভুল বুঝে ভালো হবার শপথ নিয়েছে। ওকে আপনারা মাফ করে দিন। ওকে আর মারবেন না চাচা।

জাফারের কথা শুনে শিমুলের বাবা শিমুলকে বুকে জড়িয়ে ধরেন গভীর আবেগে। শিমুলের মাও ছেলের বুকে, পিঠে, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেন। কান্না জড়ানো গলায় শিমুলের বাবা বলেন,

তুই আমাদের একমাত্র ছেলে বাবা। তার জন্য যে সবার কাছে মাথা নিচু করে চলতে হয় আমাদের।

বাবার বুকে মুখ গুঁজে শিমুল বলে,

আমার জন্য তোমাদেরকে আর কারো কাছে মাথা নিচু করে চলতে হবে না বাবা। এখন থেকে যেনো তোমরা মাথা উঁচু করে চলতে পারো, এমনভাবেই চলবো আমি।

বাবা বললেন, আজ এই খুশির দিনে আল্লাহ যেনো তোকে সেই তৌফিক দান করেন।

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক -এর উল্লেখযোগ্য কিছু বই

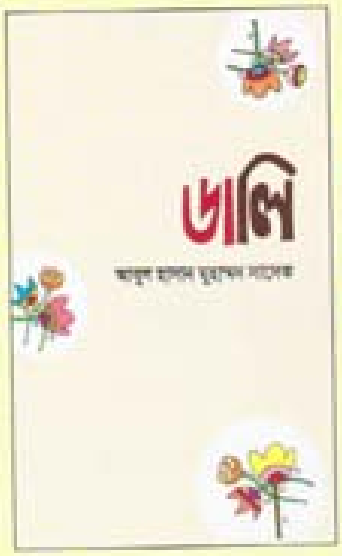

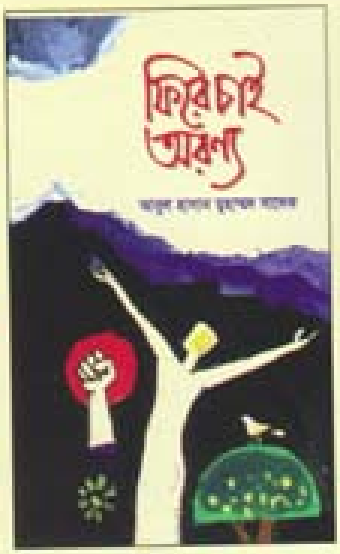

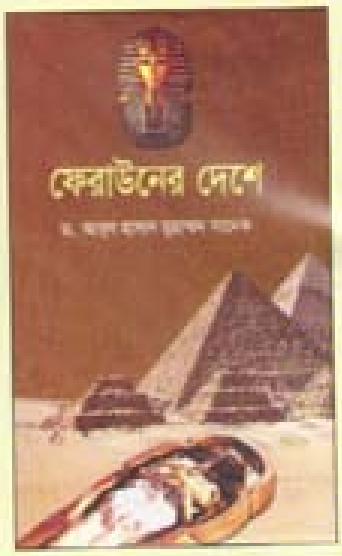

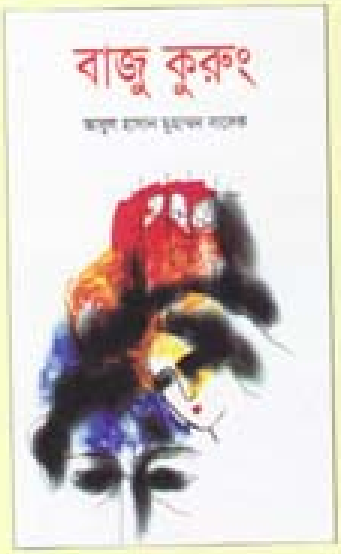

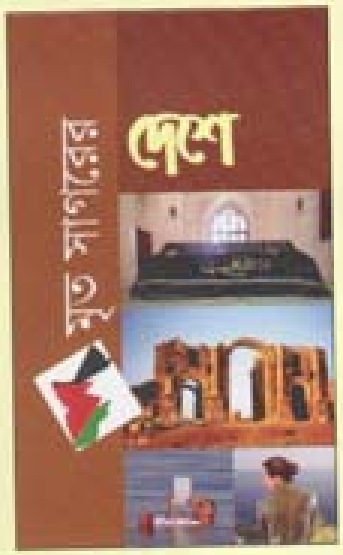

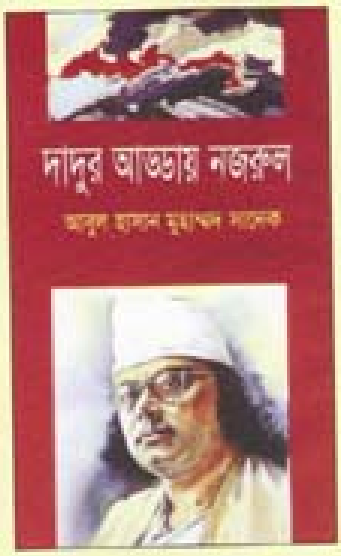

অধ্যাপক ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সালেক ১৯৫৩ সালের ১লা মে নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার পীরপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আব্দুল খালেক বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও মুক্তধারার চিন্তাবিদ ছিলেন এবং মাতা আয়েশা খাতুন প্রখ্যাত সমাজ সেবিকা ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগে প্রভাষক হিসেবে শিক্ষকতা জীবন শুরু করে একই বিভাগে সহকারী অধ্যাপক এবং চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত। অতঃপর মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে দীর্ঘ সময় কর্মময় জীবন অতিবাহিত করেন অধ্যাপক, ডীন ও সিনেট সদস্য হিসেবে।

বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ান ইউনি-ভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তাঁর প্রাপ্ত পুরস্কার ও সম্মাননার মধ্যে রয়েছে-ইন্টারন্যাশনাল ম্যান অব দ্যা ইয়ার ইন এডুকেশন ২০০০-২০০১; জার্নালিষ্ট সোসাইটি ফর হিউম্যান রাইটস এন্ড ওয়েলফেয়ার ২০০৫; কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ শিক্ষা পুরস্কার ২০০৮; স্বাধীনতা সংসদ পদক (শিক্ষা) ২০০৯; মাদার তেরেসা স্বর্ণ পদক ২০০৯; ভিন্নমাত্রা এ্যাওয়ার্ড ২০১১; স্যার সুভাষ চন্দ্র বসু এ্যাওয়ার্ড ২০১১; এবং Life Time Achievement Award by Rotary International (D3281), 2016, and Royal Academy Award (Jordan), 2016. বাংলা একাডেমির জীবন সদস্য তিনি। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিসহ অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য।

তাঁর প্রকাশিত সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে: ফেরাউনের দেশে (ভ্রমণ কাহিনী); মৃত সাগরের দেশে (ভ্রমণ কাহিনী); বাজু কুরুং (ছোটগল্প); ফিরে চাই অরণ্য (কাব্যগ্রন্থ); ক্লোনিং (কাব্যগ্রন্থ); ডালি (কাব্যগ্রন্থ); চেতনায় বায়ান্ন (সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ)। শিশুতোষ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হলো-দাদুর আড্ডায় নজরুল; এই আমার বাংলাদেশ; আমিও উড়তে চাই ; তুমিও করতে পারো ; জুঁই ও তোতা পাখি; আমি সভাপতি শিয়াল বলছি ; ছড়ার আসর; আমি যদি পাখি হতাম; দেশটাকে গড়বো ইত্যাদি।

বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিকে তাঁর অসংখ্য ছড়া, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, গবেষণা ও গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নিয়মিত।

দেশে ও বিদেশে তাঁর গবেষণামূলক অনেক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।